**পেয়াঁজের মূল্যবৃদ্ধিঃ একই চক্র আর কত**

গত বছরে পেয়াঁজের মূল্য বৃদ্ধির ধাক্কা ভয়াবহ স্মৃতির ধাক্কা বাংলাদেশের জনগণ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। গত বছর পেয়াঁজের কেজি যখন বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ মাত্রা অতিক্রম করে ২৫০/৩০০ টাকা হয়ে যায়, সেটি খানিকটা কিংবদন্তীর পর্যায়ে চলে যায়। সেই সময় পেয়াঁজ নিয়ে নানা রকম গল্প বাজারে চালু হয়েছিল। যেমন সামাজিক মাধ্যমে কেউ বলছিলেন পেঁয়াজ কাটার পর যে রকম চোখে পানি আসে, ঠিক তেমনি পেঁয়াজ কেনার আগেও পানি পড়ছে। আবার কেউ কেউ বাসায় বেড়াতে যাওয়ার সময় রসগোল্লা না নিয়ে পেঁয়াজ নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এই দামী বস্তুটি পেয়ে গৃহকর্ত্রী নিশ্চয়ই বেশ খুশী হবেন। আরেকজনের সরস মন্তব্য ছিল পেঁয়াজ কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় প্রচণ্ড আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে ঈদানীং। এই বুঝি ছিনতাইকারী আক্রমণ করে পেঁয়াজ ছিনিয়ে নিল।

গত বছরের পেয়াঁজের দামের সেই ধুন্ধুমার অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না ওঠতেই এই বছর পেয়াঁজের মূল্য বৃদ্ধির আরেকটি ঝটকা এই করোনাকালেও আবার এসে হাজির। এই সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই বাজার হালকা পাতলা গরম হচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন ভারত সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে পেয়াঁজ রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ভারতীয় নিষেধাজ্ঞা নতুন কিছু নয়। গত বছরে সেপেটম্বরের ২৯ তারিখেও তাই হয়েছিল। এর আগে ২০১৭ এবং ২০১৩ উচ্চ রপ্তানীমূল্য নির্ধারণ থেকে নিষেধাজ্ঞা সবই ঘটেছিল। এইবারও তাই ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার জন্য রকেট সাইন্টিস্ট হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ব্যবসায়ীরা আগে থেকেই জানতেন আর সেটা বোঝা গেছে যখন তাঁরা স্বাভাবিকের তুলনায় পেয়াজের জন্য এলসি এই সময়ে অনেক বেশী করে খুলেছেন। কিন্তু সরকার বা প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হলো উনারা আকাশ থেকে পড়েছেন ভারতের এই সিদ্ধান্তে। যাই হোক সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে স্থানীয় পেয়াঁজের দাম ছিল কেজি ৫০ টাকার নীচে। এর মধ্যে ১৩ তারিখে ভারতে রপ্তানী নিষিদ্ধ ঘোষণার পর সেটি হয়ে যায় ৯০ থেকে ১২০ টাকার মধ্যে। এর পরে ভারত আগে এলসি করা পেয়াঁজ ছাড় দেবে এই খবরে দাম কিছুটা কমে আসলেও বাজারে এখনো পেয়াঁজের দাম কেজিত ৭০-৯০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

বাংলাদেশের অবস্থা বিবেচনার আগে ভারত কি কারণে কয়দিন পর পর পেয়াঁজ রফতানী বন্ধ করে দেয় সেটি বোঝা দরকার। এটি শুধুমাত্র সেখানে আবহাওয়া বা বৃষ্টিপাত জনিত কারণে পেয়াঁজের ফলন কম হওয়ার কারণে মূল্য নিয়ন্ত্রণে এই ব্যবস্থা তা নয়। ভারতের পেয়াঁজের ব্যাপারে এই স্পর্শকাতরতার কারণ পেয়াঁজের মূল্যের সাথে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির পারদ ওঠানামার ঘনিষ্ঠ সংযোগ।

পেয়াঁজ ভারতে এক ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য । ভারতের অনেক প্রদেশ যেমন মহারাষ্ট্রে অন্য শাক সবজি কিনতে না পারলেও রুটি আর পেয়াঁজ সহযোগে খেয়ে নেয় অনেকে। এটা ঠিক যে ভারতের আরো অনেক অঞ্চল আছে যেখানে পেয়াঁজ তেমন একটা জনপ্রিয় নয়, যেমন দক্ষিণ কিংবা পূর্ব ভারত। কিন্তু পেয়াঁজ খুবই জনপ্রিয় উত্তরের প্রদেশগুলোতে যেখানে জনসংখ্যা অনেক বেশী এবং বেশী সংখ্যক সংসদ সদস্য সেখান থেকে নির্বাচিত হয়। তাই রাজনীতির মাঠে এই সব প্রদেশ প্রভাবশালী এবং পেয়াঁজের ভূমিকা খাদ্যাভাসে এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের রাজনীতিতে পেয়াঁজের অসীম গুরুত্ব বোঝাতে প্রায়শই ১৯৮০ সালের নির্বাচনের কথা বলা হয়। এই নির্বাচনকে কেউ কেউ ‘পেয়াঁজ নির্বাচন’ নামেও অভিহিত করেন। এই নির্বাচনে ইন্ধিরা গান্ধীর কংগ্রেস বিশাল জয় লাভ করে, ইন্দিরা গান্ধীর বাবা জওহরলাল নেহেরু ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক হিসেবে নির্বাচন জেতার পর এটাই ছিল সবচেয়ে বড় জয়। যেখানে ইন্দিরা গান্ধীর দল পায় প্রায় ৪০০ এর কাছাকাছি সীট সেখানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দী কেয়ারটেকার প্রাইম মিনিস্টার চরণ সিং এর লোক দল পায় মাত্র ৩৯টি সীট। ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় আসতে পারেন। ইন্দিরা গান্ধীর এই ক্ষমতায় ফিরে আসার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো তখন পেয়াঁজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে জনমনে তীব্র অসন্তোষ। নির্বাচনী প্রচারণায় তখন ইন্দিরা গান্ধী পেয়াঁজের মালা পরে আসতেন এবং তাঁর অনলবর্ষী ভাষণ জুড়ে একটা বড় অংশে থাকতো পেয়াঁজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন সরকারের চরম ব্যর্থতার কথা।

এরপর ১৯৯৮ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে দিল্লী আর রাজস্থানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি সরকারের পতন ঘটে সেই একই কারণে। সফল নিউক্লিয়ার বোমা পরীক্ষার দামামা দিয়ে পেয়াঁজের মূল্য বৃদ্ধির ঝাঁঝ বিজেপি চাপা দিতে ব্যর্থ হয়। ভারতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কাছে পেয়াঁজের গুরুত্ব বোঝাতে প্ল্যানিং কমিশনের একজন সদস্য আজ থেকে ২০/২৫ বছর আগেই বলেছিলেনঃ “শুধুমাত্র পেয়াঁজের দাম দিয়ে ভারতের সাধারণ মানুষ মূল্যস্ফীতি কি সেটা বোঝে। কেউ যদি পেয়াঁজ কিনতে পারে তাহলে তাকে গরীব বলা যাবে না। তাই ভারতের অনেক সরকারই এই পেয়াঁজের কারণে ভাজা ভাজা (ডিপ ফ্রায়েড) হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে।” তাই ভারত সরকার পেয়াঁজের দামের ব্যাপারে সিদুঁড়ে মেঘ দেখা ঘরপোড়া গরুর মতন আচরণ করবে এ একেবারেই অস্বাভাবিক না।

এদিকে বাংলাদেশে পেয়াঁজের দাম ভারতের মতন রাজনীতির ক্ষেত্রে এতোটা স্পর্শকাতর না হলেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য নিত্যপণ্য এতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের নিজস্ব উৎপাদনের পর চাহিদার ঘাটতি মেটাতে যেই পরিমাণ পেয়াঁজ আমদানী করতে হয় তাঁর বেশীরভাগ ভারত থেকে আসে। ভারত বিশ্বের পেয়াঁজ উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের বেশী উৎপাদন করে। আর এই উৎপাদনের ৫০ ভাগের বেশী মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক আর গুজরাট এই তিনটি রাষ্ট্রে হয়। এই অঞ্চলগুলোতে অতিরিক্ত বৃষ্টি, খরা ইত্যাদি সমস্যা হলেই পেয়াঁজের ফলন ব্যাহত হয়। যার ফলে বাজারে সরবরাহের ঘাটতি তৈরী হয়। পেয়াঁজের দাম ভারতের আভ্যন্তরীন বাজারে বাড়তে থাকে। তখন ভারত সরকার তড়িৎ ব্যবস্থা নিয়ে হয় পেয়াঁজের রপ্তানী মূল্য উচ্চ মূল্যে বেঁধে দেয় নয়তো একেবারেই রপ্তানী বন্ধ করে দেয়। এতে ভারতের আভন্তরীন বাজারে সরবরাহ বেশী থাকে ফলে দাম যতটা বাড়ার কথা সেটি বাড়ে না।

কিন্ত ভারতের পেয়াঁজ সংক্রান্ত এই নীতি খোদ ভারতেই বেশ সমালোচিত। যখন ভারত এই কাজ করে তখন তাতে সাধারন ক্রেতারা বেশ উপকৃত হলেও ক্ষতিগ্রস্থ হয় পেয়াঁজ উৎপাদনকারী চাষীরা। একটা খবরে দেখছিলাম সেরকম একজন পেয়াঁজ চাষী বেশ ক্ষোভের সুরেই বলছিলেন, ফলন ভালো হলে যখন পেয়াঁজের দাম অনেক কমে যায় তখন তো কেউ আমাদের কাছ থেকে বেশী দামে কেনে না।

যাই হোক সেটি ভারতের আভ্যন্তরীন বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা। কিন্তু এতে বাংলাদেশ যেই সমস্যার সম্মুখীন হয় সেটি হলো যে সাধারণ ক্রেতাদের উচ্চমূল্যে এই পণ্যটি ক্রয় করতে হয়। এটি উচ্চবিত্তের গায়ে তেমন কোন আচঁড় না কাটলেও নিম্ন মধ্যবিত্ত বা যারা ছোট খাট ভাতের হোটেল, রেস্টুরেন্ট চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাঁদের জন্য বাজেটের উপর এক বিশাল চাপ। তাই সরকারকে পেয়াঁজের দামের মূল্য বৃদ্ধি হালকা ভাবে নেয়ার কোন সুযোগ নাই। কিন্তু পেয়াঁজের মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে গেলে এত বছর পরেও সরকারী পর্যায়ে কোন সুচিন্তিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যায় না। বরং যা দেখা যায় তা অনেকটা এইরকমঃ

প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় যে ভারতের এই সিদ্ধান্তে মন্ত্রী মিনিস্টাররা ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান। ভারত এটা না করলেও পারতো এই রকম একটা অভিমানী ভাব। এই মন খারাপ ভাব কাটিয়ে উঠেই উনারা এর পর পেয়াঁজ ব্যবসায়ীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিন্ডিকেট করে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে এই অজুহাতে ব্যবসায়ীদের জেল জরিমানা করা হয়। এরপরেও যখন দেখা যায় যে দাম কিছুতেই কমছে না তখন ঘোষণা দেয়া হয় অন্যান্য দেশ থেকে পেয়াঁজ আসছে,কিন্তু সেই ব্যবস্থা নিতে নিতে এতো দেরী হয় যে লম্বা সময় ধরে বাজারে পেয়াঁজের উচ্চ দাম অব্যাহত থাকে। এই পেয়াঁজের দাম তখনই কমে আসে যখন নভেম্বরের পরে নতুন পেয়াঁজের ফলন উঠতে থাকে অথবা যখন ভারত তাঁর রপ্তানী আবার চালু করে।

বছরের পর বছর এই একই নাটক অংকিত হয়ে আসছে বিভিন্ন ভাবে।

অথচ এত বছর পরেও এই সামান্য বিষয়টি সরকারী পর্যায়ে বোধগম্য হচ্ছে না যে জেল জরিমানা করে একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা কোন ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বাজারের নিয়মে। বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ বাড়ানোর ব্যবস্থা করুন। দ্রুত দাম কমে না আসার কোন কারণই নেই । সেই কারণে বাজারে সরবরাহের গতিপ্রকৃতির দিকে খেয়াল রাখা বেশ জরুরী। কারণ বাজারে পেয়াঁজের চাহিদা এবং সরবরাহ এর গরমিলের কারণে দাম বাড়ে কমে। মনে রাখতে হবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ীদের কারসাজি করার সুযোগ অত্যন্ত কম।

এইজন্য শুধু পেয়াঁজ কেন, যে কোন নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হলেই সব সময় ব্যবসায়ীদের পেছনে না লেগে প্রথমেই দরকার চাহিদা এবং যোগানের নির্ভরযোগ্য পরিমাপ। চাহিদার সম্বন্ধে ধারণা থাকলে সরকার সেইমতন বাজারে সরবরাহ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারী যেইসব হিসেব দেয়া হয় তাতে শুভংকরের ফাঁকি থেকে যায়। তাঁর একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেই।

ডেইলী স্টার, ডিসেম্বর ০৯, ২০১৭ এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সব মিলিয়ে পেয়াঁজের চাহিদা ২২-২৪ লাখ টন ধরা হয়। আর সেই বছর ১৮.৬৬ লাখ মে.টন পেয়াঁজ উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদন গত বছরের তুলনায় সোয়া লাখ টনের চেয়ে বেশী। সেই সাথে ১০ লাখ টনের উপর পেয়াঁজ আমদানীও হয়েছে। তাই কাগজে কলমে চাহিদার চেয়ে যোগান অন্তত চার লাখ টনের বেশী হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তো বাজারে পেয়াঁজের মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে কমে আসার কমে আসার কথা। কিন্তু দেখা গেলো যে পেয়াঁজের দাম বেড়ে ১০০ টাকা ছাড়িয়ে যায় সেই বছর। তার মানে এইসব তথ্যের মধ্যে কোন গুরুতর গরমিল রয়েছে।

যে কোন খাদ্যপণের চাহিদার পরিমাপক বেশ জটিল। অনেক শ্রমসাধ্য এবং নিবিড় গবেষণা ছাড়া সেটি সম্ভব না। যেহেতু মানুষের খাদ্যাভাস পরিবর্তনশীল তাই সেটি নিয়মিত কয়েকবছর পর পর হাল নাগাদ করাও প্রয়োজন হয়। এই কাজটি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে সেটি বলা বেশ কঠিন।

অন্যদিকে সরবরাহের বিষয়টি চাহিদা পরিমাপের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কম কঠিন। প্রতি অঞ্চলে কি পরিমাণ জমিতে চাষ হচ্ছে তাঁর একটি সঠিক হিসেব থাকলে সে থেকে দেশীয় উৎপাদনের একটি ধারণা পাওয়া যায়। আর আমদানীর তো একেবারে কাগজে কলমেই হিসেব থাকে। এজন্য মনে হয় চাহিদার হিসেবেই একটি বিশাল সমস্যা রয়ে গেছে। তাই সরকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিৎ শুধু পেয়াঁজ নয়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্য পণ্যের একটি সঠিক চাহিদার হিসাবের নিয়মিত ব্যবস্থা রাখা । শুরু থেকে যদি এই হিসাবটা পরিষ্কার থাকে তাহলে কিন্তু সরকার যথেষ্ট সময় পাবে আগে থেকেই একটি সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য। সেই অনুযায়ী যখনই পেয়াঁজ বা এই জাতীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তখন দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী বাড়িয়ে বা আভন্তরীন কোন সমস্যা থাকলে সেটির মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু আবারও বলছি সেজন্য দরকার সঠিক তথ্য ভান্ডার এবং সেই তথ্য বিশ্লেষন করে তড়িৎ এবং সঠিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপযুক্ত লোকবল এবং মানসিকতা।

সেই পথে না হেঁটে ভারতের পেয়াঁজের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে, ভারত রপ্তানী বন্ধ করে দিলে অভিমানী হয়ে মন খারাপ করলে ফি বছর পেয়াঁজের দামের ঝাঁঝে আমরা খাবি খেতেই থাকবো। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ কিন্তু আমাদের হাতেই আছে। আমরা সেই পথে কবে যাবো?

রুশাদ ফরিদী

শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

rushad.16@gmail.com